সাম্প্রতিক সময়ে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের উপায়

ডাঃ সিরাজুম মুনিরা

বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ ডায়রিয়াজনিত রোগ। WHO তথ্যমতে প্রতিবছর ডায়রিয়ায় পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রায় ৫,২৫,০০০ শিশু মারা যায়। বিশ্বব্যাপী, প্রতিবছর প্রায় ১.৭ বিলিয়ন শিশু ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়, অথচ ডায়ারিয়াজনিত মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য।

বাংলাদেশে প্রতিবছরই সাধারণত শীতের শুরু ও গরম মৌসুমে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই বছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ডায়রিয়া দেখা দিয়েছে এবং মার্চের মাঝামাঝি থেকে বেশ ব্যাপকহারে তা বাড়তে শুরু করেছে। সাধারণত প্রতিবছর এর প্রকোপ শুরু হয় এপ্রিলের শুরু থেকে এবং ছয় থেকে আট সপ্তাহ তা চলতে থাকে। কিন্তু এই বছর ডায়রিয়া যে শুধু আগেভাগেই শুরু হয়েছে তাই নয়, রোগীর সংখ্যা আগের যেকোনো বছরের চাইতে অনেক বেশি। এবছর গরম একটু আগেই শুরু হয়েছে। মার্চ মাসে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখা গেছে, এই ধরনের তাপমাত্রায় খাবারে দ্রুত জীবাণু জন্ম নেয়। এছাড়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমে আসার জন্য করোনা ভাইরাস বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি পুরো শিথিল হয়ে যাওয়ায় মানুষজনের ঘন ঘন হাত ধোয়া এবং জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করার প্রবণতা কমে আসছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুম প্রদত্ত সারাদেশে ডায়রিয়ার রোগী জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসের তথ্যে জানা গেছে হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া মোট রোগী ৪ লাখ ৬১ হাজার ৬১১ জন। এরমধ্যে মারা গেছে দুজন। ডায়রিয়ায় সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এই বিভাগে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৫৯ হাজার ২৪৭ জন। দেশের ৮টি বিভাগের হিসাবে দেখা যায় ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ফেব্রুয়ারির চেয়ে মার্চে কমেছে। অন্য সব বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। মার্চ মাসে আইসিডিডিআরবি এ প্রতিদিন গড়ে ১ হাজারের বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে যা সর্বমোট ২৯ হাজার ৬৮১ জন। রোগী সামলাতে আইসিডিডিআরবি হাসপাতালের বাইরে অস্থায়ী তাঁবু টানানো হয়েছে, যা এখানে সাম্প্রতিক কোন বছরে দেখা যায়নি। এই সপ্তাহের শুরুতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি।মেয়াদ অনুসারে ডায়রিয়া কে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: স্বল্প স্থায়ী জলের মতো ডায়রিয়া, স্বল্প স্থায়ী রক্ত যুক্ত ডায়রিয়া, এবং এটা যদি দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়, তবে তাকে বলা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া। স্বল্পস্থয়ী জলের মতো ডায়রিয়া কলেরা সংক্রমণের কারণে হতে পারে। যদি এর সাথে রক্ত থাকে, তাহলে এটাকে রক্ত আমাশয় ও বলা হয়।

ডায়রিয়াজনিত রোগ হয় মূলত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে, সাধারণভাবেই প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যে ডায়রিয়া হয় তার মধ্যে প্রধান কারণ ই-কোলাই ও ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটেরিয়া। এগুলো ছড়ানোর মাধ্যমই হচ্ছে এসব জীবাণু দ্বারা দূষিত পানি ও পচা বাসি খাবার। অন্যদিকে শিশুদের মধ্যে শীতকালে রোটা ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া হয়ে থাকে। এই মৌসুমেও শিশুদের রোটা ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া হচ্ছে। এছাড়া শিগেলা ব্যাকটেরিয়াও একটি কারণ। প্যাথোজেনিক জীবাণুর সংক্রমণ ছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু কারণে ডায়রিয়া হতে পারে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: হাইপারথাইরয়েডিজম, দুধের মধ্যকার ল্যাক্টোজ সহ্য করার অক্ষমতা, অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু ঔষধ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ডায়রিয়া হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক কারণ নিশ্চিতভাবে জানার জন্য স্টুল কালচার বা মল পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

ই-কোলাই থেকে যে ডায়রিয়া হয় তাতে বমি হবে, পেট কামড়াবে, তারপর পাতলা মল হবে, রোটা থেকে ডায়রিয়া হলে মলের রং সবুজাভ হবে। শিগেলার হলে অল্প করে নরম মল হবে তবে তাতে মিউকাস ও পরে রক্ত থাকতে পারে। গা-গোলানো ভাব থাকতে পারে। মারাত্মক ডায়রিয়া হলে রাইস ওয়াটার স্টুল অর্থাৎ

চাল-ধোয়ার পানির মত দেখতে প্রচুর পাতলা পায়খানা হয়।মারাত্মক ডায়রিয়ার রোগীর শরীর থেকে দ্রুত পানি বের হয়ে যায়। চোখ গর্তে চলে যায়, জিহ্বা শুকিয়ে যায়, রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা চলে যায় অর্থাৎ চিমটি দিলে ত্বক কুঁচকে থাকে, অল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না। এসব লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে নাহলে পানিশূন্যতার কারণে এসব রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি আছে।

কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণত পানি ও খাবার এর মাধ্যমে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে পথে-ঘাটে উন্মুক্ত হোটেল রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য অনিরাপদ উৎস থেকে পানি ও খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস চালু রাখতে হবে। বিভিন্ন রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরকে মুক্ত রাখার সবচেয়ে "কার্যকর টিকা" হচ্ছে নিয়মিত হাত ধোয়া রাস্তার পাশে এই সময় খোলা পরিবেশে চটপটি, ফুচকা, আচার, লেবুর শরবত, আখের রস বা ফল কেটে বিক্রি করা হয়, এগুলো যথা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে এবং বাসি পচা খাবার খাওয়া যাবেনা। অত্যধিক গরমে অধিক পানির পিপাসা লাগাই স্বাভাবিক, চেষ্টা করতে হবে নিরাপদ পানি সাথে বহন করার। যেখানে পয়ঃনিষ্কাশন বা স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিম্নমানের সেখানে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশি তাই উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন বা স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে, বাড়ির চারপাশে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে রোটা ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিতে হবে।

ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর বারবার পাতলা পায়খানা করার ফলে শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। এর ফলে রোগী পানিশূন্য হয়ে পড়ে সে কারণে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের দ্রুত খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়া শুরু হলে আধা সের/লিটার বিশুদ্ধ পানিতে এক প্যাকেট খাবার স্যালাইন ভালোভাবে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে। বয়স ২ বছরের নিচে হলে তাদের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১০ থেকে ২০ চা-চামচ ২ বছরের বেশি হলে ২০ থেকে ৪০ চা-চামচ করে যতবার পাতলা পায়খানা হবে ততোবারই খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। হাতে বানানো খাবার স্যালাইন ৬ ঘন্টা পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে।মূলত গরমকালে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। ঠিকভাবে পানি ও লবণ পূরণ করা হলে এটি কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে না। বেশিরভাগ ডায়রিয়া এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু ডায়রিয়া হলে ওরস্যালাইন, খাওয়া এমনকি এর চিকিৎসা নিয়ে এখনো রয়ে গেছে কিছু ভুল ধারণা:

উচ্চ রক্তচাপ আছে এমন রোগীরা ডায়রিয়ার আক্রান্ত হলে ওরস্যালাইন খেতে বিভ্রান্তিতে ভোগেন। কেননা স্যালাইনে লবণ আছে, তাদের আশঙ্কা ওরস্যালাইন খেলে রক্তচাপ বাড়তে পারে। এটি গুরুতর ভুল ধারণা। প্রতিবার পাতলা পায়খানার সঙ্গে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও লবণ বের হয়ে যায় এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে রোগীর পানিশূন্যতা, লবণশূন্যতা এমনকি রক্তচাপ কমে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে মৃত্যুও হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে ওরস্যালাইন খেতে নিষেধ নেই। ওরস্যালাইনে চিনি বা গ্লুকোজ থাকে, তাই ডায়াবেটিস রোগীরা ওরস্যালাইন খেতে ভয় পান, মনে করেন, ওরস্যালাইন খেলে ডায়াবেটিস বাড়তে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওরস্যালাইনে যে সামান্য চিনি বা গ্লুকোজ আছে, তা অন্ত্রে লবণ শোষণের কাজে ব্যয়িত হয়। সুতরাং ডায়রিয়ার সময় ডায়াবেটিস রোগীরা নির্দ্বিধায় ওরস্যালাইন খেতে পারবেন। যারা কিডনির জটিলতায় ভোগেন তারা অনেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, কারণ স্বাভাবিকভাবে তাদের নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মেপে খেতে বলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ডায়রিয়ার অধিক পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে পানিশূন্যতার ফলে কিডনি রোগ আরও বাড়তে পারে। সুতরাং প্রয়োজনে অতিরিক্ত তরল গ্রহণ করতে হবে। অনেকেই বিভ্রান্তিতে ভোগেন, ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক খাবার খেতে পারবেন কিনা। আসলে ঘরে তৈরি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত সব ধরনের স্বাভাবিক খাবারই খেতে মানা নেই। ভাত, মাছ, ডাল, সবজি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সহজপাচ্য খাবার খেতে কোনো বাধা নেই। স্তন্যপানরত শিশুরা কোনো অবস্থাতেই বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করবে না। রোগীকে কোমল পানীয় বা ফলের জুস বা আঙুর বা বেদনা খাওয়ানো যাবে না। ফিডারে শিশুকে কিছু খাওয়ানো স্বাস্থ্যকর নয়।

স্যালাইন কতটুকু খেতে হবে তা নির্ভর করবে কতবার পাতলা পায়খানা হচ্ছে বা কতটুকু পানি হারাচ্ছেন তার ওপর। ডায়রিয়ার কারণে একজন মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এক দেড় লিটারের বেশি পানি হারাতে পারেন। সবচেয়ে সহজ হিসাব হলো প্রতিবার পায়খানা হওয়ার পর স্যালাইন খাওয়া এবং অল্প অল্প করে সারা দিন বার বার খাওয়া। এর বাইরে সারা দিন পানি ও তরল খাবার যেমন স্যুপ, ডাবের পানি, ভাতের মাড় ইত্যাদি খেতে হবে। অনেক সময় ফুড পয়জনিংয়ের কারণে বমি বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতই ফার্মেসি থেকে বমি বা পাতলা পায়খানা দ্রুত বন্ধের জন্য ওষুধ খান, যা একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না। সব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক জরুরি নয়। প্রয়োজন হলো, দেহের লবণ ও পানিশূন্যতা পূরণ। দরকার হলে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যেতে পারে।

অনেকে শিরায় স্যালাইন নিতে ভয় পান। কিন্তু ডায়রিয়ায় মাত্রা যদি তীব্র হয় তাহলে শুধু মুখে স্যালাইন পান করে শরীরে সৃষ্ট পানিশূন্যতা পূরণ করা সম্ভব না। তাই প্রয়োজনে শিরায় স্যালাইন নিতে হবে। ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে তৎপর আছে।বর্তমানে ডিজিএইচএস সারাদেশে ২২টি নজরদারি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন, আইভি ফ্লুইড স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, দেশের প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র কে ডায়রিয়া চিকিৎসায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে। স্কুল হেলথ প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হচ্ছে। দেশের চলমান ডায়রিয়ার প্রকোপ মোকাবেলায় ২৩ লাখ মানুষকে মুখে খাওয়ার মারাত্মক ডায়রিয়ার টিকা দেবে সরকার। গর্ভবতী নারী ছাড়া এক বছর বয়স থেকে বড় সব বয়সের মানুষ কে এটি দেওয়া হবে। দেশের চলমান ডায়রিয়া সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্রিফিং এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ডায়রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সারাদেশে একই, ঢাকার বাইরে থেকে একজন রোগীকে আইসিডিডিআর,বি-তে আনার যাত্রা তাদের অবস্থা আরো খারাপ করে দেয়। উপজেলা, জেলা হাসপাতালে ডায়রিয়া মোকাবেলার জন্য সমস্ত সংস্থান রয়েছে। অল্প ডায়রিয়া থাকতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সর্ব স্তরের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের আশা বৃষ্টিপাত হলে বা কোব কারনে তাপমাত্রা কমে আসলে ব্যাকটেরিয়াজনিত ডায়রিয়ার প্রকোপ কমে আসবে, তবে আমরা মনে করি যতক্ষণ না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে ততক্ষন আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যমেরও উচিত ডায়রিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। মনে রাখতে হবে “প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর”।

#

লেখক- সিভিল সার্জন বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা

১৭.০৫.২০২২ পিআইডি ফিচার

প্লাস্টিক দূষণ: লাগাম টানার এক্ষণই সময়

মোছা: সাবিহা আক্তার লাকী

বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের স্বাস্থ্যকর অস্তিত্বের হুমকির আরেক নাম প্লাস্টিক দূষণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যের প্রচলন মানব জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কিন্তু এই প্লাস্টিক পণ্যটি কখনও দ্রবীভূত হয়না বলে এর দূষণ জন্ম দিয়েছে গভীর উদ্বেগের। করোনাকালে অনলাইন শপিং ও অনলাইন ফুড ডেলিভারিতে ব্যবহৃত নানা রকমের প্লাস্টিকের মোড়ক, ওয়ানটাইম চামচ, গ্লাস ইত্যাদি প্লাস্টিক দূষণের গতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আর এ দূষণ পরিবেশ, জীববৈচিত্র, অর্থনীতি ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য এক বিরাট হুমকি। সুন্দর এই ধরণীকে বাসযোগ্য করে তুলতে এক্ষণি সময় প্লাস্টিক দূষণের লাগাম টানার।

আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে আমরা যা যা ব্যবহার করি, তার অধিকাংশই প্লাস্টিকের তৈরি। ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, গৃহস্থলীর আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য বিপণন থেকে শুরু করে সর্বত্রই প্লাস্টিকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক ধাতব, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে তৈরি যেকোনো দ্রব্যের চেয়ে প্লাস্টিক সস্তা, ব্যবহারবান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়ী। ফলে বিদ্যুৎগতিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং অবচেতন মনেই আমরা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সবকিছুকে প্লাস্টিকদূষণে দূষিত করে ফেলেছি। প্লাস্টিকদূষণ আজ মানুষসহ সব জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে।

পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্য জমা হয়েছে। প্রতিবছর উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ৩৮১ কোটি টন প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ হচ্ছে একবার ব্যবহারযোগ্য (সিঙ্গেল ইউজ)। শুধু শতকরা ৯ ভাগ পুণর্ব্যবহার করা হয়।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে মহাসাগরে প্লাস্টিকের পরিমাণ প্রায় ৭৫ থেকে ১৯৯ মিলিয়ন টন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছাড়া বাস্তুতন্ত্রের প্লাস্টিক বর্জ্য নির্গমণ ২০৪০ সালের মধ্যে প্রায় তিনগুণ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মূল্যায়ন অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে এটি দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। এভাবে জমতে জমতে বড়ো বড়ো মহাসাগরে প্লাস্টিক বর্জ্য জমাকৃত এলাকা (প্যাচ) তৈরি হয়েছে।পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রশান্ত মহাসাগরে বর্তমানে প্লাস্টিক বর্জ্যের প্যাচের আয়তন প্রায় ১৬ লাখ বর্গকিলোমিটার। অনুরূপভাবে, প্লাস্টিক বর্জ্য জমাকৃত এলাকা তৈরি হচ্ছে অন্যান্য সাগর ও মহাসাগরেও।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্ট। মানুষের যাতায়াত নগন্য বললেই চলে। কিন্তু এই দুর্গম প্রকৃতিও রক্ষা পেলনা দূষণের হাত থেকে। এভারেস্টের শিখর থেকে মাত্র ৪০০ মিটার নিচেই এবার খোঁজ মিলল মাইক্রোপ্লাস্টিকের। প্লাইমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন গবেষক ইমোজেন ন্যাপারের এমন গবেষণার তথ্য প্রকাশ করেছে বিজ্ঞান পত্রিকা ‘ওয়ান আর্থ’।

মানুষের শরীরে প্রথমবারের মতো মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে ৮০ শতাংশ মানুষের রক্তেই প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র কণা খুঁজে পেয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মলে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে ১০ গুণ বেশি। অন্যদিকে প্লাস্টিকের পাত্রে যেসব শিশুদের খাবার খাওয়ানো হয় তাদের শরীরে দিনে লাখ লাখ মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা প্রবেশ করে। নতুন একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য। এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে গবেষণার এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ মার্চ ২০২২ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে এ গবেষণার বিষয়ে জানিয়েছে।

দ্য গার্ডিয়ান সূত্রে আরও জানা যায়, সাম্প্রতিক আর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মাইক্রোপ্লাস্টিক লোহিত কণিকার বাইরে ঝিল্লিতে আটকে যেতে পারে । ফলে অক্সিজেন পরিবহণের তাদের ক্ষমতা কমে যাওয়ার ঝুকি থাকে। গর্ভবতী নারীদের প্লাসেন্টাতেও কণা পাওয়া গেছে। এমনকি গর্ভবতী ইঁদুরের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা যায়, কণাগুলো দ্রুত ফুসফুসের মাধ্যমে হৃৎপিন্ড, মস্তিস্ক ও ভ্রুণের অন্যান্য অঙ্গে প্রবেশ করে।

২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাংক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের প্লাস্টিক দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে। বিশ্বব্যাংকের এ পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশের শহর এলাকায় ১৫ বছরে মাথাপিছু তিনগুণ বেড়েছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। ২০০৫ সালে মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল ৩কেজি। কিন্তু ২০২০ সালে সে পরিমাণ ৩গুণ বেড়ে ৯ কেজি হয়েছে। ঢাকা শহরে এই পরিমাণ ২২ কেজি ৫০০ গ্রাম, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি। ২০০৫ সালে ঢাকায় মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল ৯ কেজি ২০০ গ্রাম।

পরিসংখ্যানটি আরও বলছে, ঢাকায় প্রতিদিন ৬৪৬টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়।এর ৩১০ দশমিক ৭টন ময়লা ভাগাড়ে, ৭৭দশমিক ৫টন খাল ও নদীতে, ১৭ দশমিক ৩ টন নর্দমায় ফেলা হয় এবং ২৪০ দশমিক৫ টন রিসাইকেল করা হয়।

‘প্রোলিফারেশন অব মাইক্রোপ্লাস্টিক ইন কমার্শিয়াল সি সল্টস ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড লংগেস সি বিচ অব বাংলাদেশ’ শীর্ষক গবেষণায় দেশের লবণে প্লাস্টিকের উদ্বেগজনক উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এ গবেষণায় দেখা যায় এ লবণের প্রতি কেজিতে প্রায় ২ হাজার ৬৭৬টি মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে। সেখানে বলা হয়, দেশের মানুষ যেহারে লবণ গ্রহণ করে তাতে প্রতি বছর একজন মানুষ গড়ে প্রায় ১৩ হাজার ৮৮টি মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করে।

মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি এখন ভয়ংকর রুপ ধারণ করেছে। লবণ থেকে শুরু করে মাছের পেটেও এর উপস্থিতি মিলছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সমুদ্রের পানিতে পাঁচ ট্রিলিয়নের বেশি প্লাস্টিক ভেসে থাকে। ১৪ মিলিয়ন টনের বেশি প্লাস্টিক প্রতিবছর সমুদ্রে জমা হচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণ সামদ্রিক প্রাণির জন্য একক সর্বাধিক হুমকির মতো। সামদ্রিক কচ্ছপের মৃত্যু প্লাস্টিক দূষণের কারণে ঘটছে। সামদ্রিক তিমির পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। এছাড়া সামদ্রিক ছোট মাছের পাকস্থলীতেও প্লাস্টিক পাওয়া গেছে। তাই প্লাস্টিক দূষণ সামদ্রিক মৎস্য প্রজাতির জন্য হুমকিস্বরুপ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, প্লাস্টিক মাটিতে মিশতে সময় লাগে প্রায় ৪০০ বছর। ফলে এতে একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে এটি পানির সঙ্গে মিশে পানিকে করছে দূষিত। এর মাধ্যমে এসব প্লাস্টিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের সাথে ধীরে ধীরে মিশছে মাইক্রোপ্লাস্টিক, যার প্রভাব পড়ছে গোটা প্রাণিজগতে। মাইক্রোপ্লাস্টিকের কারণে ক্যান্সার, হরমোনের তারতম্য, প্রজনন প্রক্রিয়ায় বাধাসহ মারাত্মক সব ক্ষতি হচ্ছে। প্লাস্টিক মানুষের পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে প্রবেশ করে যকৃৎ,ফুসফুসসহ অন্যান্য অঙ্গে বৈকল্য তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি হজমে প্রতিবন্ধকতা, নারী ও পুরুষের বন্ধ্যত্বও তৈরি করতে পারে। কারণ প্লাস্টিক মানবদেহে হরমোনের ভারসাম্যকে বাধাগ্রস্ত করে।

প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব শুধু সামদ্রিক মাছের ওপর নয়, সামদ্রিক পাখির ওপরও রয়েছে। পাখিরা যখন প্লাস্টিক পদার্থ গ্রহণ করে, তখন তাদের পেটেও বিষাক্ত রাসায়নিক পলিক্লোরিনেটেড বায়োফেনল নির্গত হয়। এজন্য তাদের দেহের টিস্যু ধ্বংস হয়, তাদের দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ধীরে ধীরে পাখির মৃত্যু হয়। শুধুমাত্র উদ্ভিদ বা প্রাণি নয়, মানুষ প্লাস্টিক দূষনের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। থাইরয়েড হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য প্লাস্টিক দূষণ পরোক্ষভাবে দায়ী। সাধারণত প্লাস্টিক পদার্থে প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক রঞ্জক মেশানো হয়। এসব রঞ্জক কারসিনজেন হিসেবে কাজ করে ও এন্ডোক্রিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বর্তমান বিশ্বে বিপুল পরিমাণে প্লাস্টিকসামগ্রী ব্যাবহার করা হচ্ছে। যা পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত জমছে। তাই বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিককে রিসাইকেল করে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা এ বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। সম্প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ৩০ শতাংশ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে রিসাইকেল করা প্লাস্টিকের অন্যতম ব্যবহারে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিকের দূষণ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে রাস্তা তৈরির কাজে প্লাস্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার বি কে রোডটি পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে। ভারতের পর পাকিস্থানও প্লাস্টিকের রাস্তা বানিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে। দেশটির রাজধানী ইসলামাবাদের আতাতুর্ক অ্যাভিনিউয়ের রাস্তায় প্লাস্টিকের কার্পেটিং করা হয়েছে। রাস্তাটি তৈরি করতে তারা ব্যবহার করেছে প্রায় ১০ টন ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক-যা মূলত সারাদেশ থেকে সংগ্রহ করা। ধীরে ধীরে পাকিস্তানের অন্যান্য সড়কগুলোও প্লাস্টিক দিয়ে রি-কার্পেটিং করা হবে বলে জানা যায়। বিষেজ্ঞদের মতে, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি সড়কগুলো সাধারণ সড়কের তুলনায় দ্বিগুণ দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রায় ৫১ শতাংশ বেশি শক্তিশালী হয়। ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে এ পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

প্লাস্টিক পুন:ব্যবহারের নানান উপায় বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। এবারে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতল থেকেই তৈরি হবে সুগন্ধি ভ্যানিলা-যা খাদ্য, প্রসাধনী, ঔষধ, ঘর ও আসবাবপত্র পরিষ্কার জিনিসপত্র এবং বিভিন্ন ভেষজনাশক তৈরির জন্য অন্যতম উপাদান। বর্জ্য প্লাস্টিককে এভাবে পরিবেশ থেকে সরিয়েও দেওয়া যাবে অনেক কম খরচে। ফলে পুকুর, নদী,সমুদ্র ও মহাসাগরে উত্তরোত্তর বেড়ে চলা বর্জ্য প্লাস্টিকের পরিমাণ নিয়ে যে গভীর উদ্বেগ এখন বিশ্বের সর্বত্র, এই আবিষ্কার আগামী দিনে তার থেকে রেহাই পাওয়ার আলো দেখাতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে নদী প্লাস্টিকমুক্ত করতে গ্রহণ করা হয়েছে অভিনব উদ্যোগ। সেখানে নদীতে কি পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য রয়েছে তার তথ্য তারা বের করত গুগল ম্যাপ প্রযুক্তির মাধ্যমে ‘রিভার ম্যাপিং’ নামের এক পরিভাষা ব্যবহার করে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বর্জ্যের অবস্থান নির্ণয় করে তা অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে এই বর্জ্য মসুদ্রে গিয়ে পড়েনা।

প্লাস্টিক দূষণরোধে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধের বিধান করেছিল। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশের পরও এই অগ্রগামি উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়নি। তাই, আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্লাস্টিক ব্যবহার সীমিত করতে হবে, পাট ও পাটজাতপণ্য ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে, প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে আরও বেশি সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক দ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক আরোপ করে পাটজাত দ্রব্যকে সুলভ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ব্যবস্থাগ্রহণ জরুরি। বর্জ্য রিসাইক্লিং এ গ্রহণ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। যেমন- প্লাস্টিক বোতল, স্ট্র, মোড়ক, ইনস্ট্যান্ট নুডলসের মোড়ক ইট তৈরি কিংবা এ জাতীয় দীর্ঘমেয়াদি সমাধানসূত্র বের করার জন্য ব্যাপক গবেষণা চালানো প্রয়োজন।

আজকের বিশ্ব যদি আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেওয়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির গল্প হয়, তাহলে একই সাথে তা প্রকৃতি, পরিবেশ আর মানবস্বাস্থ্যের ধ্বংসের গল্পও বটে। আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা সূচকে এগিয়েছি, অথচ নিজ শহরে ভয়াবহ প্লাস্টিক দূষণে প্রতিনিয়ত নিজেরাই অবদান রেখে চলেছি। এখনই সময় সচেতন হবার। আসুন ,পাতলা পলিথিনের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য কাপড় বা পাটের তৈরি ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাই, খাদ্যসরবরাহকারীকে নন-প্লাস্টিক প্যাকেজিং ব্যবহারে চাপ প্রয়োগ করি, পানির বোতল কেনা এড়িয়ে চলি, নিজের বোতল সাথে রাখি, প্লাস্টিক কাটলারি বর্জন করি। নিজেরা সুস্থভাবে বাঁচার জন্য, পররর্তী প্রজন্মকে একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেবার জন্য প্লাস্টিক বর্জন এবং দূষণ রোধের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করি।

#

লেখক- তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

১০.০৫.২০২২ পিআইডি ফিচার